আচমকা ঘুম ভেঙে মা দেখতে পেলেন, দাউদাউ করে জ্বলছে তার ঘরের চারপাশ। সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখা লকলকে জিহ্বা বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে তার দিকে। একদম কাছে চলে এসেছে। আর কোনো পথ নেই। শিশু সন্তানটিকে বাঁচানোর তাগিদে পরম মমতায় তাকে কোলে নিয়ে ৩ তলা থেকে লাফ দিলেন মা। নিচে হা করে তাকিয়ে আছে বিস্তৃত শানবাঁধানো মেঝে।

সেদিন মায়ের পিঠের সবগুলো হাড় ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। দীর্ঘ ৭-৮ মাস চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছে, তিনি আর কখনো হাঁটতে পারবেন না। এতকিছুর পরও সেই মা খুশি ছিলেন। কারণ, তার বাচ্চাটিকে তিনি বাঁচাতে পেরেছেন।

একবার ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একজন লোক এলো। লোকটি তাকে নিজের জীবনের একটি বিরাট অপরাধের ঘটনা শোনাল।

সে বলতে শুরু করল, 'আমি এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। আমার পরে আরেকজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে রাজি হয়ে যায়। এটা আমার অহমে প্রচণ্ড আঘাত হানে। আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মেয়েটাকে খুন করে ফেলি। আচ্ছা, আমার কি এখন তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে?'

ইবনু আব্বাস বলেন, 'তোমার মা কি বেঁচে আছেন?'

সে বলে, 'না, তিনি মারা গেছেন।'

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মনোবাক্যে তাওবা করো, আর তোমার সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকো।

আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, তার মা জীবিত আছে কি না, এটা জানতে চাইলেন কেন?

জবাবে ইবনু আব্বাস বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম আর কোনো কাজ আছে কি না, আমার জানা নেই।[১]

---

[১] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, বুখারি : ৪; *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*, লালাকায়ি : ১৯৫৭; হাদিসটি সহিহ।

সূচিপত্র

জান্নাতি এক শিশুর গল্প	১৩
আমার মা এমন কেন?	২৬
বাবা তোমায় ভালোবাসি	৩৩
ওয়ালিদাইন	৩৮
চার দেওয়ালে বন্দি জীবন	৪৪
শেষ বিকেলের রোদ্দুর	৪৯
শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম!	৫৭
যে আফসোস রয়েই যাবে	৬৩
অবশেষে উপলব্ধি	৭০
হাজার কোটি বছর পরে	৭৯
একটি ডায়েরি ও আই.সি.ইউ. এর দিনরাত্রি	৮৮
মা যখন অমুসলিম!	৯৭
দায়িত্বের পালাবদল	১১১
একজন কুলসুম বানুর তীব্র প্রতিবাদ	১২৪
হেমন্তের সোনালি এক সকালে	১৩২
মায়ের হাতের বালা	১৩৭

বাবা মানেই ভালোবাসা ১৪১
সময়ের ঘূর্ণিপাকে ১৪৬
প্রশান্ত দিনের গল্প ১৫০
ধনী বাবার সন্তান ১৫৯

জান্নাতি এক শিশুর গল্প

ওর নাম আলি। আলি ইবনু আরিফ। আমাদের তৃতীয় সন্তান। ও গর্ভে আসার আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটির মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ পেরেছিলামও। এর দুই মাস আগে একবার গর্ভপাত হয়েছিল আমার। তবে আলহামদুলিল্লাহ ডিএনসি[১] করার প্রয়োজন পড়েনি। ডাক্তার বলেছিলেন, এরকম হতে পারে, অনেকে বোঝেও না, যে গর্ভপাত হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি এই যা। অনেক কেঁদেছিলাম, খুব কষ্ট লেগেছিল। তাই ওজন কমানোসহ যেসব পরিকল্পনামতো এগোচ্ছিলাম, সব বাদ দিয়ে কেবল সন্তানই চাচ্ছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ দুই মাস পর আলির খবর পেলাম। সবকিছু ঠিকঠাক যাচ্ছিল। এর মধ্যে ভয়ানক গরম পড়ল। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। গায়ে, পায়ে হালকা পানি এলো। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ ব্লাড প্রেশার নরমাল ছিল। খুব অ্যাকটিভ থাকার চেষ্টা করেছি সেসময়।

এর মাঝে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে। আসার পরদিন হঠাৎ আয়িশার বাবা অফিস থেকে কল করে বলল, 'তোমার মনে হয় অনেক পানি চলে এসেছে, একটু প্রেশারটা মাপো তো।'

---

[১] গর্ভপাতের কারণে জরায়ুতে থেকে যাওয়া টিস্যু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া, যা সার্জারির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে নিষ্কাশন হয়ে গেলে এই সার্জারির প্রয়োজন পড়ে না।

প্রেশার মাপলাম, ১০০/১৫০। হাই প্রেশার! ওকে ফোন করে জানালাম। ডাক্তার দেখালাম, ওষুধ দিলেন। দুই সপ্তাহ নিয়ন্ত্রণে থাকল প্রেশার, তারপর আবার বেশি। ডাক্তার বললেন ভর্তি হতে, মনিটরিংয়ে রাখতে হবে। ওষুধের ডোজ বাড়াতে হলো, প্রেসার নিয়ন্ত্রণে এলো, আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার এবার আল্ট্রাসাউন্ড করতে বললেন, দেখতে হবে বাচ্চা ঠিকভাবে বাড়ছে কি না। আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা গেল আলি ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বেড়েছে, কিন্তু আমার তখন চলে ৩০ সপ্তাহ! সোনোগ্রাফার ম্যাডাম ২০ মিনিট ধরে দেখলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাডাম, আমার বাবু ঠিক আছে?'

তিনি বললেন, 'হুম! তবে ছোট।'

খুব চিন্তিত মনে হলো তাকে। আমাকে রুমে আনার পর একটু শুয়েছি। ঠিক তখনই, আমার গাইনি ডাক্তারের সহযোগী আরেকজন ডাক্তার পুরো টিম নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন। আমার বড় বোন সেদিন হাসপাতালেই ছিল।

আয়িশার বাবা আমাকে রুমে দিয়ে সবে রওনা দিয়েছে অফিসের উদ্দেশে। ডাক্তাররা এসেই আমার বোনের কাছে আমার নাম জানতে চাইলেন। তারপর জানালেন আজই সিজার করতে হবে, বাবুর জন্য ঝুঁকির আশঙ্কা করছেন তারা। বোন অবাক হলো। তার প্রথম বাচ্চার সময় তারও প্রেশার হাই ছিল, কিন্তু ডাক্তাররা অপেক্ষা করেছেন ৩২ সপ্তাহ পর্যন্ত। তড়িঘড়ি সিজার করতে বলেননি। তাহলে আমার আলির ক্ষেত্রে কেন ঝুঁকির আশঙ্কা করা হচ্ছে?

ডাক্তাররা তখন বললেন, আমার প্লাসেন্টা[১] ঠিকমতো কাজ করছে না। বাচ্চার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। ওর মস্তিষ্কে কেবল রক্ত ও অক্সিজেন যাচ্ছে, কিন্তু সে পুষ্টি পাচ্ছে না। এই অবস্থাকে IUGR (Inter Uterine Growth Retardation) বলে। যদি এমন চলতেই থাকে, তাহলে মৃত শিশুর জন্ম হতে পারে। তক্ষুনি আয়িশার বাবাকে ডেকে আনা হলো। ও পথেই ছিল। ফিরে এলো সাথে সাথেই।

আমি কিন্তু শুয়ে শুয়ে শুনছি সব। মনে হচ্ছিল সবকিছু কেমন ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। আমার আলিকে বের করে ফেললে অনেক কিছুই হতে পারে! আমি

---

[১] প্লাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের দেহ থেকে বাচ্চার দেহে পুষ্টি পৌঁছায়।

কাঁদলাম, কিছু বলতে পারলাম না। একবার শুধু বোনকে বললাম, 'কেন?'

ও বলল, 'একটু ধৈর্য ধর। চিন্তা করিস না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।'

তখন মনে পড়ল হাসপাতালে আমার রুমের পাশের বেডের মেয়েটার কথা, মাত্র ২৬ বছর বয়স। বিয়ে হয়েছে ৮ বছর আগে। ৮ বছরে ২টা বাচ্চা মারা গিয়েছে। গর্ভের শিশু পরিণত হওয়ার আগেই জন্ম হয়ে যেত, জরায়ু ধরে রাখতে পারত না। তাই তৃতীয় বাচ্চার জন্য হাসপাতালেই আছে, যেকোনো ইমার্জেন্সিতে যাতে কিছু করা যায় (আলহামদুলিল্লাহ ওর বাচ্চা হয়েছে, ভালো আছে, আল্লাহ যেন হায়াত দেন আর নেক মুসলিম হতে পারে এই দুআ করি)। ওর কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলাম।

জুহর ও আসরের সালাত জমা করে পড়লাম। প্রতিটা সিজদা মনে হচ্ছিল জীবনের শেষ সিজদা। আম্মু, আব্বু, আমার ছোট বোন, ছোট মামা এলো। আমার বাবা, যিনি বিপদে পড়লে সবসময় বলেন, 'হাসবিআল্লাহ', তিনিও আজ কিছুই বলতে পারলেন না। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে নির্বাক হয়ে থাকলেন।

আমিই বললাম, 'বাবা, হাসবিআল্লাহ।'

বাবা কিছু না বলে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। আম্মুকে দেখে বললাম, 'মা, আমার আলি যদি থাকে, তাহলে যেন সুস্থ থাকে আর না থাকলে যেন আমাদের জন্য শাফায়াত করে, এই দুআ করো।'

আম্মু বললেন, 'অবশ্যই, মা।'

আমরা সবাই কাঁদলাম।

আমার স্বামীকে আল্লাহ রহম করুন, ও হাসিমুখে ছিল। আমাকে সবাই অনেক সাহস দিলো। যখন ওটির জন্য রেডি করে হুইলচেয়ারে বসানো হলো, আমি যেন চিৎকার করে বলতে চাচ্ছি, 'আমাকে নিয়ো না। আমি যাব না। আমার আলি অনেক ছোট্ট।' কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।

আলহামদুলিল্লাহ স্কয়ার হাসপাতালের পুরো টিম অপরিসীম সাহস দিয়েছে এবং আমার পর্দার পূর্ণ হিফাজত নিশ্চিত করেছে। ওটিতে যাওয়ার পর থেকেই অনেক সাহস পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ডাক্তার এলেন আর

বললেন, 'কী করব বলেন রিস্ক হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ চাইলে সব ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ।'

অপারেশন করতে করতে তিনি বলছিলেন, 'এইটুকু একটা সাইজ, আবার শক্তি দেখায়!'

কথাটা শুনে খুব ভালো লাগল। মনে হলো আলহামদুলিল্লাহ আমার আলি দুর্বল না। ম্যাডাম আমার বাচ্চাটাকে এক ঝলক দেখালেন। NICU-এর ডাক্তার ছিলেন ভেতরে, তার কাছে আলিকে হস্তান্তর করা হলো। ওর কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। পোস্ট অপারেটিভ রুমের নার্সরা খুব ভালো। প্রত্যেকেই যথেষ্ট কেয়ারিং ছিলেন আমার প্রতি। খুবই অস্থির ছিলাম আলির কোনো খবর পাচ্ছি না বলে। বের হয়েই দেখি আয়িশার বাবা দাঁড়িয়ে হাসছে, আমাকে বলল, 'মাশাআল্লাহ! কী বাচ্চা জন্ম দিয়েছ! ওর ওজন ১.০৬২ কেজি। লাইফ সেভিং একটা ইনজেকশন লাগে প্রিম্যাচিওর বেবিদের, ওর সেটা লাগেনি, লাইফ সাপোর্ট লাগেনি। শুধু ০.২ লিটার অক্সিজেন লেগেছে।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ দিয়েছেন, আল্লাহু আকবার!'

আলহামদুলিল্লাহ। তখনই বুঝেছি আমার আলি বিশেষ কেউ, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রতীক্ষার প্রহর

অক্সিজেন লাগল শুধু ৩ দিন। এরপর অপেক্ষা করছি খাবার শুরু করবে কবে। যাদের প্রিম্যাচিওর বাচ্চার অভিজ্ঞতা আছে, সবাই সাহস দিলো। এরকম বাচ্চা খুব দ্রুত বাড়ে, শুধু খাবারটা শুরু করার ব্যাপার। আমরা থাকি উত্তরা। আলির জন্য হাসপাতালের পাশে একটা বাসা খুঁজছিলাম। এক দ্বীনি ভাইয়ের সহায়তায় পেয়েও গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ। তারা আমাদের জন্য যা করেছেন তা সারা জীবনেও ভোলার মতো নয়। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মঙ্গল করুন।

সাতদিন পর খাবার শুরু করলেন ডাক্তার। ছয় ঘণ্টা পরপর খাবার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন এক মিলিলিটার করে বাড়ছে। ৩ দিন পর ছয় ঘণ্টার জায়গায় ৩ ঘণ্টা পরপর হলো। হঠাৎ ১৩ দিনের দিন ডাক্তার বলল, ওর খাওয়া বন্ধ। বাচ্চার পেট

ফুলে উঠেছে, বমিও করেছে। তখন ৯ মি.লি. ৩ ঘণ্টা পরপর চলছিল। আমি হতাশ হলাম। আলির ওজন ১ কেজি ৮৫ গ্রাম মাত্র। খাবার বন্ধ করায় ৫ দিনে কমে হলো ৯০০ গ্রাম! ডাক্তার ষষ্ঠ দিনের দিন বললেন পেট ফোলা কমেছে। আবার খাবার শুরু করবেন। আবার ৬ ঘণ্টা পরপর ১ মি.লি. দিয়ে শুরু। যখন ১০ মি.লি. পর্যন্ত গেলাম, আবার খাওয়া বন্ধ! তখন আলির বয়স ২৩ দিন। ওজন ১ কেজি ৬০ গ্রাম। ৪ দিন পর ল্যাক্টোজ ফ্রি ফর্মুলা দেওয়া হলো আমারটা বাদ দিয়ে।

ওর যখন ৩৭ দিন, তখন আবার পেট ফুলে উঠল। আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ডাক্তাররা বললেন, ওর NEC (Necrotizing enterocolitis)[১] স্টেজ ওয়ান। আমরা খুঁজতে লাগলাম বাংলাদেশে NICU ডাক্তারদের মধ্যে ভালো কে আছেন। তখন ডাক্তার জাবরুলের নাম খুব শুনছি। আমরা খুঁজে পেলাম তাকে, গেন্ডারিয়াতে আসগর আলি হাসপাতালে আছেন। উনি সেখানকার সিইও।

আমাদের আলি বাড়ছে না, আর ৪০ দিন হয়ে গেছে স্কয়ার হাসপাতালে। খরচ প্রচুর। তবে আল্লাহ সহজ করে দিলেন সেটাও। আমার বাবা, আম্মু, ছোট মামা, বোনেরা অনেক সাহায্য করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার জাবরুল আমাদেরকে বললেন, তিনি চেষ্টা করে দেখতে চান। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে তিনিও মানুষ, হায়াত-মউতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ডাক্তার সাহেব দ্বীনদার। তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আয়িশার বাবা ঠিক করল পরদিনই আলিকে আসগর আলি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে। আলির আবার চোখে ROP (Retinopathy of Prematurity) পজিটিভ এসেছে। যে কারণে ওর চোখে লেজার করতে হবে।

যেদিন স্কয়ার থেকে ওকে বের করা হলো, সেইদিনই আসগর আলি NICU টিম ওর দায়িত্ব নিল আর বাংলাদেশ আই হাসপাতালে লেজার শেষে ওকে নিয়ে গেল। আমরাও গেলাম। আলির বয়স ৪০ দিন, ওজন ৯১০ গ্রাম। ডাক্তার বললেন ওর যে কন্ডিশন তাতে ওকে খাবার দেওয়া যাবে না অন্তত ১৪ দিন! কিন্তু ওর ওজন খুবই কম আর অকাল্ট ব্লাড টেস্ট পজিটিভ এসেছে। অর্থাৎ ওর পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এজন্য একটু চিন্তার বিষয় আছে। তবে যদি ব্যাংকক থেকে আমরা কিছু নিউট্রিশন ইনজেক্টিবলস আনতে পারি, যা ছোট

---

[১] পরিপাকতন্ত্রের এক ধরনের রোগ, যা বিশেষ করে নবজাতকদের হয়ে থাকে।

বাচ্চাদের উপযোগী, তাহলে তারা চেষ্টা করবেন ওজনটা ধরে রাখার। আমি খুব ভেঙে পড়লাম, তবে বাইরে বাইরে স্থির ছিলাম তখনো। আলির একটা জামা, যেটা পরিয়ে NICU থেকে বের করা হয়েছে, আর একটা তোয়ালে দেওয়া হলো আমাকে। আমরা তখনো পান্থপথের বাসায়, আলির জামা আর তোয়ালে বুকে নিয়ে অনেক কাঁদলাম।

আয়িশার বাবা ঠিক করলেন, আমরা আমাদের উত্তরার বাসায় ফেরত যাব। সপ্তাহে ২ দিন আলিকে দেখতে আসব। শুক্র-শনিবার ছাড়া হাসপাতালে আসা সম্ভব ছিল না ট্রাফিকের কারণে। আলির মেডিসিন কীভাবে জোগাড় হবে তা নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। আয়িশার বাবা খোঁজ করলেন। আমি ফেইসবুকে খোঁজ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমাদের সাহায্য করতে। ফেসবুকে যতবার যতজন বোন আমার পোস্টটা শেয়ার করেছেন, তারা লিখেছেন, 'please help, she is my sister.'

আমি কেঁদেছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি যখন প্রথম দ্বীনি জীবন বেছে নিয়েছিলাম, তখন ছিলাম পুরো একা। আলহামদুলিল্লাহ এখন কত ভাই বোন, কত্ত বড় পরিবার! মাশাআল্লাহ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ওই রাতটা বিভীষিকার মতো কাটল। পরদিন সকালে চারিদিক থেকে খবর এলো আলির ওষুধ পাওয়া গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। পাঁচ সেট ওষুধ জোগাড় হলো। চার সেট আলি গিফট পেয়েছে। এক বোন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না, কিন্তু আলির জন্য ওষুধ লোক মারফত আমার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আমার থেকে আলি আর ওর বাবার নাম জেনে নিলেন, বললেন তিনি সাদাকা করবেন। বারাকাল্লাহু ফীহা। অবশ্য আলির আকিকা ৭ দিনের দিন করানো হয়েছিল।

ভাইয়েরা ব্যাংকক, মালয়েশিয়াতে ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে প্রেসক্রিপশন জোগাড় করে আমার আলির জন্য ওষুধ এনেছেন। বারাকাল্লাহু ফিহিম। আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা চেষ্টা করেছেন তবে সফল হননি, যারা দুআ করেছেন সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ করুন, আপনাদের সব গুনাহ ক্ষমা করুন, আমিন।

আলির জন্য তার খালামনি, মামা, ফুপি, চাচ্চুদের আনা ওষুধগুলো দেওয়া হলো। ১৪ দিন খাবার বন্ধ থাকার পর ওর খাবার আবার শুরু করা হলো এক মি.লি. আট

ঘণ্টা পরপর। ১৮ জুলাই ওর চোখের আরেকটা লেজার করানো হয়েছে। ওইদিন ওকে দেখে খুব প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল। চারটা ছবি তুললাম এম্বুলেন্সে বসে। ওর দুধের পরিমাণ অল্প অল্প করে বাড়ছে। ডাক্তাররা খুব আশাবাদী, আমরাও খুশি। তাই বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনের ল্যাক্টেশন স্পেশালিস্ট একজন আপুর সাথে ফেইসবুকে যোগাযোগ করলাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলাম ২৪শে জুলাই। আপু কিছু টিপস দিলেন এরপর ওকেতানি থেরাপি দিলেন। এটা জাপানি একটা থেরাপি, বুকের দুধের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য। মহাখালিতে পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউটে এরকম একটা ফাউন্ডেশন ১৯৮৯ সাল থেকে আছে আর আমি জানতামই না! আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য খুব উপকারী ছিল। দুধ ডিপ ফ্রিজ করে রাখতে শুরু করলাম। জানলাম সাধারণ রুমের তাপমাত্রায় বুকের দুধ ছয় ঘণ্টা ভালো থাকে, রেফ্রিজারেটরে চব্বিশ অথবা বারো ঘণ্টা, আর ডিপ ফ্রিজে ছয় মাস ভালো থাকে। আর ডিপ ফ্রিজ করা দুধ যদি আবার রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়, তাহলে ৩ দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম।

৯ দিন পর, ২৭ জুলাই সকালে, আয়িশার বাবা-মাত্র অফিসে পৌঁছেছে। ওই সময় হাসপাতাল থেকে কল এলো, আলির পেট আবার ফুলে উঠেছে, আর ওর অবস্থা ভালো নয়। আয়িশার বাবা সাথে সাথে হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল। আমি কিছুই জানি না তখনো। হাসপাতালে যাওয়ার সময় ভেবেছিল হয়তো গিয়ে দেখবে আলি আর এই দুনিয়ায় নেই। কিন্তু গিয়ে শুনল আলি লাইফ সাপোর্টে চলে গেছে। আমাকে তখন কল করল। প্রথমে জিজ্ঞেস করল কী করছি আমি।

বললাম, 'তেমন কিছু না, কেন বলো তো?'

'মাহী, ঘাবড়ে যেয়ো না একটা খারাপ খবর আছে।' ফোনের ওই প্রান্ত থেকে আয়িশার বাবার এ কথা শুনে আমি মনে একটা ব্যথা অনুভব করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আলির কী হয়েছে?'

গতরাতে লাইফ সাপোর্টে চলে যাওয়ার কথা বলল আয়িশার বাবা। আমি অনেক কাঁদলাম।

২৮ তারিখ ওকে দেখতে গেলাম। আয়িশার বাবা কখনোই NICU-এর ভেতরে ঢুকে আলিকে দেখত না। ও নিতে পারবে না বলত। আমি যেতাম, তবে কম, ইনফেকশন হয়ে যাবে এই ভয় পেতাম। সেদিন আমি ভেতরে গেলাম, লাইফ সাপোর্টে আমার

আলি। ওকে দেখে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে। এটা অবশ্য ওকে সবসময়ই মনে হতো আমার। মনে হতো ওর অনেক কষ্ট, বলতে পারে না। আলির মাথায় ক্যানুলা দেখলাম। পায়ে হাত দিলাম। ওর সাড়া শব্দ নাই। কিন্তু বুঝলাম ও ঘুমাচ্ছে, বুক ওঠানামা করছে। আমরা প্রতিদিন খবর নিচ্ছি। মিনিমাম লাইফ সাপোর্টে আছে, ২ দিন পরপর চেষ্টা করা হলো খুলে ফেলার, কিন্তু খুললেই নিশ্বাস নেয় না। ডাক্তাররা বললেন, ও চেষ্টা করে না। আমার খুব খারাপ লাগল, আমার আলির শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওর চেষ্টা করার শক্তি নেই। লাইফ সাপোর্টে ওজন মাপা যাচ্ছে না। তবে আমি দেখছি ও অনেক শুকিয়ে যাচ্ছে। ও খেতে পারছে না যে, তাই। ডাক্তাররা বললেন NEC স্টেজ ২। এই বাচ্চাগুলোর হুট করেই অবস্থার অবনতি হয়। এক সময় গিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হয়। তবে ওর অবস্থা এখনো ভালো, কারণ লাইফ সাপোর্টে থাকলেও তা মিনিমাম সেটিংয়ে আছে। ওর ফিডিং শুরু হলো আবার। আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে এক সপ্তাহ ওকে দেখতে যেতে পারলাম না। আমরা থাকি উত্তরা, আর আসগর আলি হাসপাতাল পুরান ঢাকায়, অনেক দূর।

এরই মাঝে আমার শ্বশুরের নিউমোনিয়া হলো, হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো তাকে। তাই যেতে পারিনি। ১১ ও ১২ আগস্ট ২ দিন গেলাম। ১১ তারিখ আলির পাশে অনেকক্ষণ ছিলাম। ওকে ডাকলাম, ওর মাথায় হাত বোলালাম, বুকে, হাতে, পায়ে হাত দিলাম। ওর কোনো সাড়া শব্দ নাই। ডাক্তাররা জানালেন ওর অ্যাকটিভিটি নেই। যতবার লেজার করানোর জন্য ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ততবার ওর কান্না শুনেছি। এছাড়াও লাইফ সাপোর্টে যাওয়ার আগেও শুনেছি। ও হাত-পা নাড়িয়ে কাঁদত। কিন্তু এখন ও কিছুই করে না।

এরপর আবারও পরের সপ্তাহ যেতে পারলাম না। আয়িশার বাবার চিকুনগুনিয়া হলো। ওকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। এর মধ্যে ৩ দিন অন্তর অন্তর আলিকে দুধ দিয়ে আসতে হয়েছে। আমার বাবা, আম্মু দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকে আলিকে দেখার সাহস করেননি। একদিন আমি গেলাম আমার বাবার সাথে। আমিও সেইদিন ঢুকতে পারলাম না। NICU-তে প্রবেশ করার জন্য স্পেশাল একটা গাউন থাকে, খুব সকালে যাওয়ায় সেটা ছিল না। আসলে আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি আমার কষ্ট কম করার ইচ্ছা করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

২৮ তারিখে হাসপাতাল থেকে কল এলো, আমাদের বলা হলো আলির অবস্থার তো কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, আমরা আরও চেষ্টা করে দেখব কি না!

অবশেষে উপলব্ধি

এক.

পড়ন্ত বিকেল। লাল-কমলা রঙের মিশেলে ঘোলাটে পশ্চিমের পুরো আকাশটা। গোলাপি চেরি ফুলগুলো বাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। মৃদু বাতাসে দুয়েকটা ফুল ঝরে পড়ছে নিচের সবুজ ঘাসের গালিচায়। এই অপরূপ প্রকৃতি স্পষ্ট দেখা যায় বড় বিল্ডিংটার সবকটা জানালা দিয়ে। তিনতলা থেকে নিচের দিকে চোখ বোলালে দৃষ্টিসীমার পুরোটাই সবুজে ঢাকা। সম্পূর্ণ জমিনটাই লন্ডনের বিখ্যাত এক মেডিকেল স্কুলের অন্তর্ভুক্ত।

এখানকার প্রতিটি বিল্ডিংয়ের কারুকার্যও চোখধাঁধানো। রোহানের চোখ সেই দৃশ্য লুফে নিচ্ছে তিনতলা ক্লাসের জানালার ফাঁক দিয়ে। তবে বেশিক্ষণ বাইরে তাকানোর সময় নেই। খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ক্লাস নিচ্ছেন প্রফেসর। সবসময় তার ক্লাস মেলা ভার। নামকরা এই প্রফেসর যেন অমাবস্যার চাঁদ।

রোহানের মেডিকেল পড়াশোনা শেষের দিকে। এই প্রফেসরের ক্লাস মানে বাড়তি কিছু। ছেলেপেলে সব মরিয়া হয়ে থাকে তার একটা ক্লাস করার জন্য। আর এমন একজন ব্যক্তির ক্লাস খুব সহজেই করতে পারছে রোহান। সবটাই মেধা দিয়ে কামানো, এমনই মনে করে সে। শতভাগ স্কলারশিপে গুটিকয়েক ছাত্র সুযোগ পেয়েছে এখানে পড়ার। তারমধ্যে রোহান একজন। এখান থেকে কিছু ছাত্র সুযোগ পাবে রিসার্চ করবার। একটা সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় আছে রোহান।

লন্ডনের এমন ফুরফুরে বিকেলে সবাই নরম রোদে বসে পিকনিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রোহানের সেই সুযোগ নেই। শেষ ক-টা দিনের চাপ বিস্তর, ক্লান্তি নিয়েই ক্লাস করতে হচ্ছে তাকে। বিশাল অডিটোরিয়াম সমান লম্বাটে এক ক্লাস রুম। ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রের মনোযোগ প্রফেসরের দিকে। পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ রোহানের ফোন বেজে উঠল। ব্রুমম...ব্রুমম...। থমথমে ক্লাসে ভাইব্রেশনের শব্দটাও খুব বিকট শোনাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে ফোনটা কেটে সাইলেন্ট করে দেয় রোহান। এদিকে পকেটে থাকা ফোনের বাতি তখনো জ্বলছে।

বেশ লম্বা এক ক্লাস শেষে বন্ধুদের সাথে গল্পের আসরে যোগ দিয়েছে রোহান। এমন সুন্দর আবহাওয়ায় গল্পের আসরও জমেছে বেশ। কোনো এক সময় যে তার ফোনটা খুব বেজেছিল, সেটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। হাসিঠাট্টার মাঝে মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতেই দেখে এখনো কারও কলে ফোনটা বাজছে। প্রচুর বিরক্তি অনুভব করে এবার, ভ্রু কুঁচকে সাথে সাথে কেটে দেয় কলটা। কে জানে ওপাশে কীসের এত তাড়া? একের পর এক ফোন-কল আসছে তো আসছেই।

দুই.

ঢেঁকি ভানার ধুপুরধাপুর শব্দে কেঁপে উঠেছে পুরো চিতলপুর গ্রাম। ধান এবার ফলেছে বেশ। গ্রামজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, যে বাড়ির উঠোনেই নজর যায় সবখানেই আনন্দ আর হাসি-খেলার ছলে ধান ভানার দৃশ্য।

আঙুরি বেগমের উঠোনেও ভিন্ন চিত্র নয়। তাকে দেখলে বোঝার উপায় নেই বয়সটা ঠিক কোন দুই অঙ্কে এসে ঠেকেছে। বেশ পরিশ্রমী মহিলা। গ্রামের কতজন কত কথা বলেন, ছেলেকে বিয়ে করিয়ে একটা বউ নিয়ে এলেও তো কাজের বোঝা কিছুটা কমে যেত। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কাজ করতে নাকি তার ভালোই লাগে। এজন্যই বুঝি তিনি কখনো এসব কথায় ভ্রুক্ষেপ করেন না।

এদিকে ঢেঁকির তালে তালে বাড়তে থাকে গ্রামের মহিলাদের গল্পের পরিধি। এই বাড়িতে এটা হয়েছে, ঐ বাড়িতে ওটা হয়েছে। আরও কত কী! কানাঘুষা, হাসাহাসিতে বেশ আনন্দ অনুভব করে তারা। কিন্তু সেদিকে আঙুরি বেগমের কোনো খেয়াল নেই। তার সম্পূর্ণ মনোযোগ ধান ভানাতে। এতে কিছুটা বিরক্তই হয় পাশে থাকা মহিলারা।

‘আরেহ বেটি হুনছসনি, কী আকাম হইছে? ঐ যে পুরান বাড়ির মোফাজ্জল, অয় তো বিদেশ গিয়া বউ-বাচ্চা, বাপ-মা হগগোলরে ভুইলা গেছে, আর নাকি আইত ন। হুনছসনি আঙুরি?’ কিছুটা ঠেস মারা গলায় বললেন পাশের বাড়ির খালা।

ঠেস দিয়ে বলার কারণ আছে তার কাছে। আঙুরি বেগমের অন্যকিছুতে ধ্যান না থাকলেও, এমন ধারার কথা শুনলে কানদুটো খাড়া হয়ে যায়। কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা দুশ্চিন্তায় খচখচিয়ে ওঠে তার ভেতরটা।

‘না না, সবার লগেই কি এমন হয় নাকি? আমার লগে এমন হইব না। আল্লাহ ভরসা।’ নিজেকে মনে মনে আশ্বস্ত করতে থাকেন আঙুরি বেগম। তবুও মন যে বড়ই অবাধ্য। চিন্তা দূর করা দায়।

অতিরিক্ত কাজের চাপ আর ভেতরের অপ্রকাশিত যন্ত্রণা সব মিলে আঙুরি বেগমের বুক-পেটের ব্যথাটা আবারও দেখা দিয়েছে। এবার আগের তুলনায় বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঢেঁকি ভানা রেখে বুক ধরে বসে পড়েন আঙুরি বেগম। পাশে থাকা মহিলারা ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর। এ দৃশ্য তাদের কাছে নতুন নয়। দুদিন পরপর একই ঘটনা হওয়ায়, পাশের ঘরের খালা শুরু করলেন তার পুরোনো বিলাপ, ‘কইছিলাম ডাক্তারের কাছে যা। না, তুই তো যাবি না। তুই তোর বৈদেশি পোলার আশায় পইড়া আছস! কবে আইব, কবে তোর চিকিৎসা করব এই আশায়। অয় যদি না আহে তহন কি তুই চিকিৎসা না নিয়াই মইরা যাইতে চাস?’

উথলে ওঠা কষ্ট চাপা দিয়ে আঙুরি বেগম বলেন, ‘আমার কিছু হয় নাই গো খালা। একটু বিশ্রাম করলেই সাইরা উঠুম। আর আমার পোলারে বৈদেশি কইয়েন না গো খালা। আপনেগোই সম্পদ। দেইখেন ঠিকই একদিন বড় ডাক্তার সাব হইয়া ফিরা আইব, আপনাগো চিকিৎসা করনের লাইগা। আল্লাহ চাইলে সব হইব। খালি দোয়া করেন।’

বুক আর পেটের ব্যথায় এবার আর বেশি কিছু বলার শক্তি পেলেন না আঙুরি বেগম। নাহয় প্রতিবারই গ্রামের মানুষের মুখ বাঁকানো কথার সান্ত্বনাসুলভ জবাব দেন। তবে দিন শেষে সবাইকে সান্ত্বনার ঔষধ গেলাতে পারলেও কেন জানি নিজের ব্যথার মলম খুঁজে পান না তিনি। এ কি গ্রামের লোকের কথার প্রভাব নাকি অপরিবর্তনীয় সত্য—জানা নেই তার।

এই অজপাড়াগাঁয়েরই তো ছেলে রোহান। আজ সে তার স্বপ্নের জায়গায়। রোহান

বেশ ছোট থাকতে বাবাকে হারায়। আঙুরি বেগম একা হাতে স্বামীর রেখে যাওয়া ভিটেটুকুতে কঠোর পরিশ্রম করে বড় করেছেন তার একমাত্র সন্তানকে। ছেলে ডাক্তার হবে। গ্রামের অসুস্থ মানুষের সেবা করবে। বছরের পর বছর ধরে, নিদ্রাহীন চোখে এই স্বপ্ন বুনে গিয়েছেন রোহানের মা। তবে মাঝে মাঝে কিছুটা ভয়ে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। হওয়াটাও স্বাভাবিক। সেই যে রোহান গেল, আজ সাত বছর হতে চলল, এখনো একটি বারের জন্যও এলো না ছেলে। কত ছুটি চলে যায় কিন্তু রোহান যে আর গ্রামের কাদা-মাটি মাড়ায় না। তার নাকি ভালো লাগে না গ্রামের এই ভেজা ভেজা পরিবেশ। অথচ সে তো এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকছে অন্য এক বরফের দেশে। সেই দেশের ভেজা পরিবেশ খুব পরিষ্কার ফকফকে আর নিজ জন্মস্থানটা গোবরের দুর্গন্ধযুক্ত–এটাই হয়তো পার্থক্য।

এত চিন্তার সাথে পাল্লা দিয়ে যেন আঙুরি বেগমের বুকের ব্যথাটা বাড়ছে দিনকে দিন। রোহানকে সেই কতদিন ধরে ফোন দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কেন জানি ছেলে ফোন ধরছে না। হঠাৎ ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। আঙুরি বেগম কোনোমতে ছেলের নম্বরে কল দেন। এত ব্যথার কারণ কী! নিশ্চয়ই তার ছেলে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবে। কিন্তু আফসোস,তীব্র আশা নিয়ে করা কলটাও ধরল না ছেলেটা। এপাশ থেকে একের পর এক কল যাচ্ছে তো যাচ্ছে, ওপাশ থেকে শুধু ফেরত আসছে সংযোগ কেটে যাওয়ার বিপ-বিপ আওয়াজ।

তিন.

ঘড়িতে রাত আটটা। সারাদিনের লাগাতার ক্লাস, পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন শেষ করে মেসে ফিরেছে রোহান। সব কিছু গুছিয়ে ফোনটা হাতে নিতেই দেখে মায়ের নম্বর থেকে ১৩ টা মিসড কল। বিরক্তির ছাপ রোহানের মুখমণ্ডলে স্পষ্ট। একরকম না পারতেই কল দেয় মায়ের নম্বরে।

কল ধরতে কিছুটা দেরিই হয়ে গেল আঙুরি বেগমের, শেষের রিংয়ে রিসিভ করলেন। ছেলের ফোন মানে তার কাছে ঈদের চাঁদ। এমন খুশির ঝংকার তুলে ‘বাপজান’ বলে ডাক দেন যেন পুরো দুনিয়ার সুখ পেলেন ছেলের একটা কলে। কিন্তু এই মায়া ভরা ডাকে মন গলে না রোহানের। বিরক্তি বাড়ে বহুগুণ, ‘কী ব্যাপার? সবসময় এত দেরি করে ফোন ধরেন কেন?’

সলজ্জ গলায় আঙুরি বেগম জবাব দেন, ‘বাপজান, আমার একটু চোখটা লাইগা

আসছিল। গ্রামে তো এখন ভোর রাইত, আর জানোই তো, বাপজান, মায়ের সারা রাইত ঘুমাইতে অনেক কষ্ট হয়! এই সময়ে যা একটু ঘুম আসে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, থামেন। এখন আপনার শরীর কেমন সেটা বলেন?' মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই থামিয়ে দেয় রোহান।

এদিকে ছেলে নিজ থেকে মায়ের শরীরের হালত জিজ্ঞেস করেছে—এর থেকে বড় পাওয়া যেন আর নেই আঙুরি বেগমের। এই শরীরের অবস্থা জানাতেই তো এত মরিয়া হয়ে ছেলেকে কল দিচ্ছিলেন।

উৎসুক গলায় দ্রুত জবাব দেন তিনি, 'বাপজান, আমার বুক-পেটের ব্যথাটা অহনও সারে নাই। কী করমু বাপজান! তুমি বাড়িত আইসা মারে একটু দেইখা যাও।'

যতটা আশাবাদী হয়ে আঙুরি বেগম কথাটা জানান দিলেন, ততটাই রাগের স্ফুলিঙ্গো ফেটে পড়ল রোহান, 'আমি হাজার বার বলেছি ভালো একজন ডাক্তার দেখান। আমার আশায় বসে থাকার মানে কী? এত আবেগে দুনিয়া চলে না। নাপা খান। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি রাখলাম। আর সারাদিন আমাকে কল দেবেন না। আমার ক্লাস থাকে।'

আগ্নেয়গিরির লাভা পিণ্ডের মতো কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে ফোনটা কেটে দেয় রোহান। এদিকে আঙুরি বেগম তখনো ফোনটা কানের সাথে ধরে রাখলেন। দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার চোখের পাশ থেকে। চোখ মুছে নিজেকে বুঝ দিলেন, এগুলো কিছু না, ছেলে ব্যস্ত। বড় ডাক্তার সাহেবরা বুঝি এমনই হয়। তারা আবেগে গা ভাসায় না। কিন্তু একবার তো জিজ্ঞেস করতে পারত, 'মা, আপনার ঠিক কোথায় ব্যথা করছে? কেমন ব্যথা করছে?'

চার.

স্মৃতি ব্যাপারটা ভীষণ যন্ত্রণার। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য অল্প পরিমাণ কিছু তিক্ত স্মৃতিই যথেষ্ট। বুক-পেট আর অনেকটা অন্তরের ব্যথা নিয়ে গ্রামের ক্লিনিকে পৌঁছান আঙুরি বেগম। চেম্বার খুব পুরোনো, তার থেকেও পুরোনো থুড়থুড়ে-বৃদ্ধ গ্রামের একমাত্র ডাক্তার। ডাক্তার সাহেব দু-একবার হাতের নাড়ি দেখে ধরে ফেললেন আঙুরি বেগমের কী সমস্যা! গ্রামের নাম করা ডাক্তার তিনি, সবাই তার ঔষধে সুস্থ হয়, তাহলে আঙুরি বেগম বাদ যাবেন কেন? যদিও এখন ডাক্তার সাহেবরই কিছুটা